بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৪ জানুয়ারি, ২০২২ মোতাবেক ১৪ সুলাহ্, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল গত সপ্তাহের পূর্বের খুতবায়। সেখানে সুরাকার উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সে-ও পুরস্কারের লোভে মহানবী (সা.)-কে পাকড়াও করার সংকল্প নিয়ে বের হয়েছিল। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি তার সামনে উপর্যুপরি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তখন সে মহানবী (সা.)-এর কাছে আবেদন করে যে, রাজত্ব যখন আপনার হবে তখন যেন আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয় আর (এ মর্মে সে) একটি নিরাপত্তানামাও লিখিয়ে নেয়। এ প্রেক্ষাপটে কতিপয় রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি বর্ণনা অনুযায়ী তার ফিরে যাবার সময় মহানবী (সা.) তাকে সম্বোধন করে বলেন, **'হে সুরাকা! তোমার অবস্থা কেমন হবে যখন পারস্য সম্রাটের কঙ্কণ তোমার হাতে থাকবে। সুরাকা আশ্চর্য হয়ে পিছন ফিরে তাকায় এবং বলে কিসরা বিন হুরমুয? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, সেই কিসরা বিন হুরমুয'**। অতএব, যখন হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে কিসরার কঙ্কণ এবং তার মুকুট ও কোমরবন্ধনী আনা হয় তখন হযরত উমর (রা.) সুরাকাকে ডেকে বলেন, তোমার হাত এগিয়ে দাও। (তিনি) তাকে কঙ্কণ পরিয়ে দেন এবং বলেন, বল সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার, যিনি কিসরা বিন হুরমুয থেকে এই উভয়টি ছিনিয়ে (আমাদের) দান করেছেন। **(মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ ওয়াল্লাযীনা মায়া'হু লি আব্দিল হামীদ জুওদাতুস্ সিহার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫, মিশরের আল্ হিজরাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

এটিও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হিজরতের সফরের সময় নয়, বরং যখন আল্লাহ্র রসূল (সা.) হুনায়েন এবং তায়েফ থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন সুরাকা বিন মালেক **'জি'রানা'** নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণ করে। আর 'জি'রানা' মক্কা ও তায়েফের পথে মক্কার নিকটবর্তী একটি কূপের নাম। তিনি (সা.) সুরাকাকে বলেন, তোমার তখন কী অবস্থা হবে যখন তুমি কিসরার কঙ্কণ পরিধান করবে। **(বুখারী, শরাহ্ আল্ কিরমানী, ১৪তম খণ্ড, পৃঃ ১৭৮, কিতাবু বাদইল খালকে, বাবু আলামাতিন নবয়্যতি ফীল ইসলামি, বৈরুতের দ্বারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবীয়্যে থেকে প্রকাশিত), (ফরহঙ্গে সীরাত, পৃঃ ৮৮, করাচীর যওয়ার একাডেমি থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

এ সম্পর্কে 'সীরাত খাতামান্ নবীঈন' পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন যে, "সামান্য দূরে যেতেই হযরত আবু বকর (রা.) দেখেন, এক ব্যক্তি ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁদের পিছু ধাওয়া করছে। এতে হযরত আবু বকর (রা.) ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কেউ একজন আমাদের পিছু ধাওয়া করছে। তিনি (সা.) বলেন, কোন চিন্তা করো না, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাথে আছেন। উক্ত পশ্চাদ্ধাবনকারী ছিল সুরাকা বিন মালেক, যে

নিজের পশ্চাদ্ধাবনের ঘটনা স্বয়ং নিজের ভাষায় এভাবে বর্ণনা করে যে, মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে বেরিয়ে যান তখন কুরাইশ কাফিররা এই ঘোষণা করে যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.) অথবা আবু বকর (রা.)-কে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে তাকে এত পরিমাণ পুরস্কার দেয়া হবে। আর এই ঘোষণার কথা তারা নিজেদের বার্তাবাহকদের মাধ্যমে আমাদেরকেও অবগত করে। (একথা সুরাকা বলছে,) এরপর একদিন আমি আমার গোত্র বনু মুদলেজ-এর একটি সভায় উপবিষ্ট ছিলাম এমন সময় কুরাইশদের সেসব (বার্তাবাহক) ব্যক্তির মধ্য থেকে একজন আমাদের কাছে আসে, আর আমাকে সম্বোধন করে বলে; আমি এখনই সমুদ্র তীরের দিকে দূর থেকে কতিপয় চেহারা দেখেছি। আমার মনে হয় তারা হয়ত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাথী হবে। সুরাকা বলে, আমি তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারি যে, অবশ্যই তাঁরাই হবে।"

এরপর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সেই বিশদ বিবরণই তুলে ধরেছেন যা সুরাকার পশ্চাদ্ধাবনের সময় তার বিরুদ্ধে লটারী বের হওয়া আর তার ঘোড়া (বালুতে) দেবে যাওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যাহোক, সুরাকা বলে, আমার সাথে সংঘটিত ঘটনার কারণে আমি মনে করেছিলাম, এই ব্যক্তির ভাগ্য-নক্ষত্র এখন তুঙ্গে রয়েছে আর অবশেষে মহানবী (সা.)-ই বিজয়ী হবেন। কাজেই, সন্ধির সুরে আমি তাঁকে বলি, আপনার জাতি আপনাকে হত্যা করার কিংবা ধরে আনার এই এই পরিমাণ পুরস্কার নির্ধারণ করেছে আর মানুষ আপনার সম্পর্কে এই এই পরিকল্পনা করছে আর আমিও এই সংকল্পেই এসেছিলাম, কিন্তু এখন আমি ফিরে যাচ্ছি। এরপর সুরাকার অবশিষ্ট বিবরণ বর্ণিত হয়, অতঃপর সুরাকার কঙ্কণ পরিধান সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেন যে, "সুরাকা যখন ফিরে যেতে উদ্যত হয় তখন তিনি (সা.) তাকে বলেন, হে সুরাকা! তখন তোমার অবস্থা কীরূপ হবে যখন তোমার হাতে কিসরা বা পারস্য সম্রাটের কঙ্কণ থাকবে? সুরাকা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কিসরা বিন হুরমুয অর্থাৎ ইরানের বাদশাহ্? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। (এতে) সুরাকা বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। কোথায় আরবের মরুর এক বেদুঈন আর কোথায় পারস্য সম্রাটের কঙ্কণ? কিন্তু খোদার অপার লীলা দেখুন! হযরত উমর (রা.)'র যুগে যখন ইরান বিজিত হয় আর গণিমতের মাল হিসেবে পারস্য সম্রাটের ধনভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয় তখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে কিসরার কঙ্কণও মদীনায় আসে। হযরত উমর (রা.) সুরাকাকে ডাকেন যিনি মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, আর নিজের সামনে তার হাতে কিসরার কঙ্কণ পরান, যা অত্যন্ত মূল্যবান মণিমুক্তায় সজ্জিত ছিল।" {সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃঃ ২৪০-২৪২}

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ পূর্বক বলেন যে,

"তারা অর্থাৎ, মক্কার লোকেরা ঘোষণা করে যে, যে-ই মুহাম্মদ (সা.) অথবা আবু বকর (রা.)-কে জীবিত অথবা মৃত ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তাকে পুরস্কার স্বরূপ একশ' উটনী প্রদান করা হবে। আর এই (পুরস্কার) ঘোষণার সংবাদ মক্কার চতুষ্পার্শ্বের গোত্রগুলোকে প্রেরণ করা হয়। অতএব, তখন একজন বেদুঈন নেতা সুরাকা বিন মালেকও উক্ত পুরস্কারের লোভে তাঁর পিছু

ধাওয়া করে। খুঁজতে খুঁজতে সে মদীনার পথে গিয়ে তাঁর দেখা পায়। সে যখন দু'টি উটনী এবং তাদের আরোহীদের দেখে আর বুঝতে পারে যে, (তাঁরা) মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গী, তখন সে নিজের ঘোড়া তাঁদের পেছনে ছোটাতে থাকে।

এরপর তিনি (রা.) পুরো ঘটনা বিবৃত করেন অর্থাৎ, সুরাকার ঘোড়া হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া এবং লটারী করার (অর্থাৎ, শুভ-অশুভ নির্ণয় করার) ঘটনা। এরপর তিনি বলেন, সুরাকা বলে, মহানবী (সা.) পরম গাম্ভীর্যের সাথে নিজের উটনীতে চড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি পেছন ফিরে আমাকে দেখেনও নি, কিন্তু আবু কবর (রা.) {মহানবী (সা.)-এর কোন ক্ষতি না হয়– এই ভয়ে} বার বার মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখছিলেন।"

এই পশ্চাদ্ধাবনের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করার পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, "...সুরাকা যখন ফিরে যেতে উদ্যত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য হতে সুরাকার ভবিষ্যতের অবস্থা তাঁর (সা.) কাছে প্রকাশ করেন আর সে অনুসারে তিনি (সা.) তাকে বলেন, হে সুরাকা! তখন তোমার কী অবস্থা হবে যখন তোমার হাতে পারস্য সম্রাটের কঙ্কণ শোভা পাবে। সুরাকা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কিসরা বিন হুরমুয অর্থাৎ, (আপনি) ইরানের বাদশাহ্র কঙ্কণের (কথা বলছেন)? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী ষোলো-সতেরো বছর পরে গিয়ে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়। সুরাকা মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে আসে। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.) এরপর হযরত উমর (রা.) খলীফা হন। ইসলামের ক্রমবর্ধমান মহিমা বা বিস্তৃতি দেখে ইরানীরা মুসলমানদের ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ করতে থাকে কিন্তু ইসলামকে পদপিষ্ট করার পরিবর্তে তারা নিজেরাই ইসলামের মোকাবিলায় পরাভূত হয়। পারস্য সম্রাটের রাজধানী ইসলামী সৈন্যবাহিনীর অশ্বের পদাঘাতে পিষ্ট হয় আর ইরানের ধনভাণ্ডার মুসলমানদের করতলগত হয়। ইরানী সাম্রাজ্যের যেসব সম্পদ ইসলামী সেনাদলের হস্তগত হয় তাতে সেই কঙ্কণগুলোও ছিল যা ইরানী রীতি অনুসারে ইরান-সম্রাট সিংহাসনে আরোহনের সময় পরিধান করতো। সুরাকা মুসলমান হওয়ার পর নিজের এই ঘটনাটি, যা মহানবী (সা.)-এর হিজরতকালে তার সাথে সংঘটিত হয়, অত্যন্ত গর্বের সাথে মুসলমানদেরকে শোনাতো আর মুসলমানরা একথা জানতো যে, মহানবী (সা.) তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে সুরাকা! তখন তোমার অবস্থা কী হবে যখন কিসরা'র কঙ্কণ তোমার হাতে শোভা পাবে? হযরত উমর (রা.)'র সামনে যখন গণিমতের মাল (তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) এনে রাখা হয় এবং তিনি সেগুলোর মাঝে কিসরা'র কঙ্কণ দেখেন, তখন পুরো চিত্র তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অর্থাৎ, সেই দুর্বলতা ও বলহীনতার সময়, যখন খোদার রসূলকে মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনায় আসতে হয়েছিল; সেই সুরাকা এবং অন্য লোকদের তাঁর পেছনে এজন্য ঘোড়া নিয়ে ছোটা যে, তাঁকে হত্যা করে বা জীবিতাবস্থায় যে কোন রূপে মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছে দিলে তারা শত উটনীর মালিক হয়ে যাবে আর এমন সময়ে সুরাকাকে মহানবী (সা.)-এর এই কথা বলা যে, হে সুরাকা! তখন তোমার অবস্থা কী হবে যখন কিসরা'র কঙ্কণ তোমার হাতে শোভা পাবে– (এটি) কত বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী

ছিল! কী নির্মল গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ ছিল! হযরত উমর (রা.) নিজের সামনে কিসরা'র কঙ্কণ দেখতে পেয়ে খোদা তা'লার কুদরত বা শক্তি তাঁর দৃষ্টিপটে ভেসে ওঠে। তিনি (রা.) বলেন, সুরাকাকে ডাক। সুরাকাকে ডাকা হলে হযরত উমর (রা.) তাকে কিসরা'র কঙ্কণ নিজ হাতে পরার আদেশ দেন। সুরাকা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূলের খলীফা! মুসলমান (পুরুষের) জন্য তো স্বর্ণ পরা নিষিদ্ধ। হযরত উমর (রা.) বলেন, হ্যাঁ, নিষিদ্ধ, কিন্তু এমন উপলক্ষ্যে নয়। আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তোমার হাতে সোনার কঙ্কণ (পরিহিত) অবস্থা দেখিয়েছিলেন। হয় তুমি এই কঙ্কণ (হাতে) পরবে অথবা আমি তোমাকে শাস্তি দিব। সুরাকা'র আপত্তি কেবল শরীয়তের কারণে ছিল, অন্যথায় তিনি নিজেও মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখার আকাঙ্ক্ষী ছিল। সুরাকা সেই কঙ্কণ নিজের হাতে পরে নেয় এবং মুসলমানরা এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী স্বচক্ষে পূর্ণ হতে দেখে।" **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২২৪-২২৬)**

অতঃপর বর্ণিত হয়েছে যে, ফিরে আসার সময় একটি কাফেলা, যেটিকে কুরাইশরা-ই তাঁর (সা.) সন্ধানে প্রেরণ করেছিল, সুরাকাকে তাঁর (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সুরাকা শুধু এটিই নয় যে, মহানবী (সা.) সম্পর্কে (তাদেরকে) কিছুই বলে নি, বরং এমনভাবে কথা বলে যার ফলে পশ্চাদ্ধাবনকারীরা ফিরে যায়। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার্ রাশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৯, জিমাউ আবওয়াবিল হিজরাতি ইলাল মদীনাহ্, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত)**

হিজরতের এই ভ্রমণে উম্মে মা'বাদের একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। হিজরতের এই সফরে একটি তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পাথেয়'র সন্ধানে মহানবী (সা.)-এর এই কাফেলা যাত্রা বিরতি দেয়। এটি ছিল উম্মে মা'বাদের তাঁবু; তার পূর্ণ নাম ছিল আতেকা বিনতে খালেদ। তিনি খুযাআ গোত্রের বনু কা'ব শাখার সদস্যা ছিলেন। তিনি হযরত হুবায়েশ বিন খালেদ (রা.)'র বোন ছিলেন; যিনি সাহাবী হওয়ার এবং হাদীস বর্ণনা করার সম্মান লাভ করেছিলেন। উম্মে মা'বাদের স্বামীর নাম ছিল আবু মা'বাদ (রা.)। বলা হয়, তিনিও মহানবী (সা.)-এর বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই মৃত্যু বরণ করেন। আবু মা'বাদের প্রকৃত নাম জানা নেই। উম্মে মা'বাদের তাঁবু কুদায়েদ নামক স্থানে ছিল। কুদায়েদ মক্কার অদূরে অবস্থিত একটি উপশহরের নাম, যা রাবেগ থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এখানেই প্রসিদ্ধ 'মানাত' প্রতিমা স্থাপিত ছিল। মদীনাবাসীরা এর পূজা করত। **(আর্ রওযুল উন্‌ফ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৫, নাসবু উম্মে মা'বাদিন ওয়া যওজিহা, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত), (ফরহঙ্গে সীরাত, পৃঃ ২৩২)**

উম্মে মা'বাদ ছিলেন একজন সাহসী এবং দৃঢ়চেতা নারী। তিনি তার তাঁবুর প্রাঙ্গণে বসে থাকতেন আর সেখান দিয়ে যাতায়াতকারীদের আতিথেয়তা করতেন। তিনি (সা.) ও তাঁর সঙ্গীরা তার কাছে মাংস ও খেজুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যেন তাঁর কাছ থেকে তা কিনতে পারেন, কিন্তু তাঁর কাছে এগুলোর কিছুই ছিল না। তখন উম্মে মা'বাদের গোত্র অভাবগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষ কবলিত ছিল। উম্মে মা'বাদ বলেন, আমাদের কাছে যদি কিছু থাকত তাহলে আমরা তোমাদের কাছ থেকে তা দূরে রাখতাম না। মহানবী (সা.) তাঁবুর এক কোণায় একটি ছাগল দেখতে পান। তিনি (সা.)

জিজ্ঞেস করেন, হে উম্মে মা'বাদ! এই ছাগলটির কী হয়েছে? তিনি নিবেদন করেন যে, এটি এমন একটি ছাগল যাকে দুর্বলতা নিজ পাল থেকে দূরে রেখেছে। অর্থাৎ, এর মাঝে পালের সাথে বাইরে চরতে যাওয়ার শক্তিও নেই। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, এর (ওলানে) কি দুধ আছে? তিনি বলেন, এটি এর চেয়েও অনেক বেশি দুর্বল, এর পক্ষে দুধ দেয়া সম্ভবই নয়। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আমাকে এর দুধ দোহন করার অনুমতি দিবে? তিনি বলেন, আপনি যদি এর (ওলানে) দুধ দেখতে পান তাহলে নিঃসঙ্কোচে দুধ দোহন করে নিতে পারেন, আমার কোন আপত্তি নেই। তখন মহানবী (সা.) সেই ছাগলটি আনিয়ে সেটির ওলানে হাত বুলান আর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করেন এবং উম্মে মা'বাদের জন্য তার ছাগলের মাঝে কল্যাণের দোয়া করেন। ছাগলটি তাঁর (সা.) সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে এবং সেটি অনেক দুধ দেয় আর জাবর কাটতে আরম্ভ করে। এরপর তিনি (সা.) তার কাছ থেকে এমন একটি পাত্র চান যেটি এক দল লোককে তৃপ্ত করতে পারত। সেটিতে তিনি এতটা দুধ দোহন করেন যে, ফেনা পাত্রের কিনারা পর্যন্ত উঠে আসে। এরপর তিনি (সা.) উম্মে মা'বাদকে পান করান, এমনকি তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে যান। অতঃপর তিনি (সা.) নিজ সাথীদের পান করান, এমনকি তারাও পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। তাদের সবার শেষে তিনি (সা.) নিজে পান করেন এবং বলেন, জাতিকে যে পান করায় সে সবার শেষে পান করে। এরপর কিছুটা বিরতি দিয়ে তিনি (সা.) সেই পাত্রে পুনরায় দুধ দোহন করেন, এমনকি সেটি পূর্ণ হয়ে যায়, আর তিনি সেটিকে উম্মে মা'বাদের কাছে রেখে দেন। এরপর তিনি (সা.) সেই ছাগলটি ক্রয় করে সফরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার্ রাশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৪-২৪৫, ফী হিজরাতে রসূলিল্লাহে (সা.)..., বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত)**

বর্ণিত হয়েছে যে, একদিকে মহানবী (সা.) এবং তাঁর (সা.) নিবেদিতপ্রাণ সফরসঙ্গী হযরত আবু বকর (রা.) ঐশী সাহায্য ও সমর্থনে সুরক্ষাকারী ফিরিশ্‌তাদের সাহচর্যে সফররত ছিলেন আর অন্য দিকে মক্কাবাসীরা তখনও পরাজয় বরণ করে নি। তারাও অনবরত তাঁর (সা.) পশ্চাদ্ধাবনে রত ছিল। অতএব, কুরাইশদের পক্ষ থেকে প্রেরিত পশ্চাদ্ধাবনকারী একটি দল মহানবী (সা.)-এর সন্ধান করতে করতে উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে এসে উপস্থিত হয় আর তারা নিজেদের বাহন থেকে নেমেই মহানবী (সা.)-এর বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করে। উম্মে মা'বাদ ঘটনা কিছুটা আঁচ করতে পারেন এবং বলেন, তোমরা এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ যা আমি পূর্বে কখনো শুনি নি, আর তোমরা কী চাচ্ছ তা-ও আমি বুঝতে পারছি না। তারা যখন কিছুটা কঠোর ভাষায় তাদের প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে, তখন অভিজ্ঞ ও সাহসী এই নারী বলেন, তোমরা যদি এখনই আমার কাছ থেকে দূর না হও তাহলে আমি চিৎকার করে আমার গোত্রের লোকদের ডাকব। তারা এই ভদ্র মহিলার মানমর্যাদার বিষয়ে অবগত ছিল তাই সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার মাঝেই মঙ্গল মনে করে। **(মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ ওয়াল্লাযীনা মায়া'হু... লি আব্দিল হামীদ জুওদাতুস্ সিহার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৭, মিশরের আল্ হিজরাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

পথিমধ্যে মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত যুবায়ের (রা.)'র সাক্ষাৎ হয়, তিনি মুসলমানদের একটি কাফেলার সাথে সিরিয়া থেকে বাণিজ্য শেষে ফিরে আসছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা.) মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে সাদা পোশাক পরিধান করান। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মানাকেব, বাবু হিজরাতিন্ নবীয়্যে (সা.) ওয়া আসহাবিহি ইলাল মদীনাতি, হাদীস নং: ৩৯০৬)**

এই সাক্ষাতের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, পথিমধ্যে যুবায়ের বিন আল্ আওয়াম (রা.)'র সাথে (কাফেলার) সাক্ষাৎ হয়। তিনি সিরিয়া থেকে বাণিজ্য শেষে মুসলমানদের ক্ষুদ্র একটি দলের সাথে মক্কায় ফিরছিলেন। যুবায়ের (রা.) একজোড়া সাদা কাপড় মহানবী (সা.)-কে আর একজোড়া হযরত আবু বকর (রা.)-কে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন এবং বলেন, আমিও মক্কা হয়ে অতি শীঘ্র মদীনায় এসে আপনার সাথে মিলিত হব। **{সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃ: ২৪২}**

অতঃপর বুখারীর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, (হিজরতের সেই সফরে) কখনো এমনও হয়েছে যে, চলতি পথে অন্য বেশ কয়েকটি কাফেলার লোকেরা, যারা হযরত আবু বকর (রা.)-কে তাঁর অধিকাংশ বাণিজ্যিক সফরের কারণে সেসব স্থানেই দেখেছিল, জিজ্ঞেস করতো যে, আপনার সাথে ইনি কে? উত্তরে তিনি (রা.) বলতেন, ইনি আমার পথপ্রদর্শক। **هذا الرجل يهدينى السبيل** (উচ্চারণ: **হাযা ইয়াহ্দীনীস্ সাবীলা**) অর্থাৎ, **এই ব্যক্তি আমাকে পথের দিশা দিয়ে থাকেন**। মানুষ ভাবতো তিনি (পথ দেখানো) গাইড আর হযরত আবু বকর (রা.)'র কথার অর্থ ছিল হিদায়াতের পথ। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মানাকেবিল আনসারি, বাবু হিজরাতিন্ নবীয়্যে (সা.) ওয়া আসহাবিহি ইলাল মদীনাতি, হাদীস নং: ৩৯১১)**

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) পেশাদার ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে এই রাস্তা দিয়ে বারবার আসা-যাওয়া করতেন। এ কারণে অধিকাংশ মানুষ তাঁকে চিনতো, কিন্তু মহানবী (সা.)-কে তারা চিনতো না। তাই তারা হযরত আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করতো যে, তোমার সামনে কে এগিয়ে যাচ্ছে? হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, هذا يهدينى السبيل অর্থাৎ, ইনি আমার পথপ্রদর্শক। তারা মনে করতো, সম্ভবত ইনি কোন গাইড হবেন যাকে হযরত আবু বকর (রা.) পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাথে নিয়েছেন, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)'র কথার অর্থ হতো ভিন্ন। **{সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃ: ২৪২}**

চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, আট দিন সফরের পর ঐশী সাহায্যে অবশেষে সোমবার তিনি (সা.) মদীনার পথে কুবায় গিয়ে পৌঁছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) সোমবার জন্মগ্রহণ করেন, সোমবার মক্কা থেকে যাত্রা করেন, সোমবার মদীনায় পৌঁছেন এবং সোমবারেই তাঁর (সা.) ইন্তেকাল হয়। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার্ রাশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৩, জিমাউ আবওয়াবিল হিজরাতি ইলাল মদীনাহ..., বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত), {সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃ: ২৪৩}**

কুবা একটি কূঁপের নাম ছিল, যার কারণে গোটা বসতি কুবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে আনসারদের বনু আমর বিন অওফ গোত্রের লোকদের বসবাস ছিল। এই বসতি মদীনা থেকে দুই মাইল দূরত্বে অবস্থিত। **(মু'জিমুল বুলদান লিশিহাবিদ্ দ্বীন ইয়াকূতাল্ হামাভী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭,'কুবা' শব্দের ব্যাখ্যায়, বৈরুতের আল্ আসরিয়াহ্ ছাপাখানা হতে ২০১৪ সালে মুদ্রিত)**

অনেকের মতে মদীনা থেকে কুবার দূরত্ব ছিল তিন মাইল। একে আলিয়াহ্-ও বলা হয়ে থাকে। **(ফরহঙ্গে সীরাত, পৃঃ ২৩০)**

মদীনার মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর মক্কা থেকে যাত্রার সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন। তারা প্রতিদিন সকালে **'হাররাহ্'** পর্যন্ত যেতো এবং তাঁর (সা.) জন্য অপেক্ষা করতো। (মদীনা দু'টি **'হাররাহ্'**র মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। কালো পাথুরে ভূমিকে **'হাররাহ্'** বলা হয়। মদীনার পূর্বদিকে **'হাররাতুল ওয়াকিম'** অবস্থিত যেটিকে **'হাররাহ্ বনূ কুরায়যাহ্'**ও বলা হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয়টি হল, **'হাররাতুল ওয়াবুরাহ্'** যা মদীনার পশ্চিমে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত।) এরপর দুপুরের খরতাপ তাদেরকে ফিরিয়ে আনতো। অর্থাৎ, তারা সকালে যেতো, অপেক্ষা করতো এবং দুপুরে ফিরে আসতো। একদিন বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর মদিনাবাসী ফিরে আসে। তারা যখন নিজেদের বাড়িতে পৌঁছে তখন এক ইহুদী ব্যক্তি নিজের দুর্গগুলোর একটিতে কোন কাজের জন্য আরোহণ করে, যেন সেটির দেখাশোনা করতে পারে। তখন সে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাথীদের দেখতে পায়, যারা সাদা পোশাক পরিহিত ছিলেন। তাদের ওপর থেকে মরীচিকা দূর হচ্ছিল। তখন সেই ইহুদী নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলে, হে আরবের অধিবাসীরা! তোমাদের সেই মনিব আসছেন যার জন্য তোমরা প্রতীক্ষারত। মুসলমানরা তখন দ্রুত অস্ত্র হাতে তুলে নেয় এবং **'হাররাহ্'** নামক স্থানে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হয়। তিনি (সা.) তাদেরকে নিয়ে ডানদিকে ঘুরেন এবং বনু আমর বিন অওফ-এর পাড়ায় গিয়ে তাদের সাথে অবতরণ করেন। সেদিন ছিল সোমবার এবং রবিউল আউয়াল মাস। হযরত আবু বকর (রা.) মানুষের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হন এবং মহানবী (সা.) নীরবে বসেছিলেন। আর আনসারদের মধ্য থেকে যারা মহানবী (সা.)-কে (পূর্বে) দেখে নি, তারা আসে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে সালাম দিতে থাকে। ইত্যবসরে মহানবী (সা.)-এর ওপর রোদ এসে পড়ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) সামনে এগিয়ে আসেন এবং তিনি নিজের চাদর দিয়ে মহানবী (সা.)-এর ওপর ছায়া প্রদান করেন। তখন মানুষ মহানবী (সা.)-কে চিনতে পারে। মহানবী (সা.) বনু আমর বিন অওফ-এর মহল্লায় দশ রাতের অধিক, কিংবা বুখারীর অন্য একটি হাদীস অনুযায়ী চৌদ্দ রাত অবস্থান করেন আর সেই মসজিদের ভিত্তি রাখেন যা তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তাতে তিনি (সা.) নামায আদায় করেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাব মানাকেবিল আনসারি, বাবু হিজরাতিন্ নবীয়্যে (সা.) ওয়া আসহাবিহি ইলাল মদীনাহ্, হাদীস নংঃ ৩৯০৬), সহীহ্ বুখারী কিতাবুস্ সালাত, হাদীস নংঃ ৪২৮), (ফরহঙ্গে সীরাত, পৃঃ ১০১-১০২)**

বুখারীর এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) ১০-এর অধিক রাত কুবায় অবস্থান করেন। একটি বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) বনু আমর বিন অওফ, অর্থাৎ কুবায় সোম, মঙ্গল, বুধ

ও বৃহস্পতিবার (মোট) চারদিন অবস্থান করেন এবং জুমুআ'র দিন মদীনার উদ্দেশ্যে যান। আরেকটি বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি (সা.) ২২ রাত (কুবায়) অবস্থান করেন।

(আস্ সীরাতুল্ হাববিয়্যাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫, বাবু আরযে রসূলুল্লাহ্ (সা.) নাফসিহী... বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর কুবায় আগমনের উল্লেখ করে বলেন, "সুরাকাকে বিদায় জানানোর পর কয়েক মনযিল অতিক্রম করে মহানবী (সা.) মদীনায় পৌঁছেন। মদীনাবাসীরা ব্যাকুল হয়ে মহানবী (সা.)-এর জন্য অপেক্ষা করছিলেন আর তাদের জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে যে, যেই সূর্য মক্কার (অধিবাসীদের) জন্য উদিত হয়েছিল, তা মদীনার লোকদের জন্য উদিত হচ্ছে। তারা অর্থাৎ, মদীনাবাসীরা যখন এ সংবাদ পায় যে, মহানবী (সা.) মক্কায় নেই, সেদিন থেকেই তারা তাঁর (সা.) জন্য প্রতীক্ষা করছিল। তাদের প্রতিনিধিরা প্রতিদিন মদীনার বাইরে কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত তাঁর (সা.) সন্ধানে বের হতো এবং সন্ধ্যায় নিরাশ হয়ে ফিরে আসত। তিনি (সা.) যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছেন তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রথমে তিনি কুবাতে অবস্থান করবেন, যা মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম। একজন ইহুদী তাঁর (সা.) উটনীগুলোকে আসতে দেখে বুঝতে পারে যে, এটি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাফেলা। তখন সে একটি টিলার উপর আরোহণ করে এবং চিৎকার করে বলে, **হে ক্যায়লাহ্'র সন্তানগণ**! (ক্যায়লাহ্ মদীনাবাসীদের এক দাদী ছিল) তাই সেখানকার লোকদের ক্যায়লাহ্'র সন্তান বলেও সম্বোধন করা হতো, তোমরা যার প্রতীক্ষা করছিলে তিনি এসে গেছেন। এ ধ্বনি পৌঁছামাত্রই মদীনার সব মানুষ কুবা অভিমুখে ছুটতে থাকে। কুবার অধিবাসীরা এটি ভেবে আনন্দে উল্লসিত হয় যে, খোদার নবী তাদের কাছে অবস্থান করতে এসেছেন। তখন এরূপ একটি ঘটনা ঘটে যা মহানবী (সা.)-এর পরম দীনতার প্রমাণ বহন করে। মদীনার অধিকাংশ মানুষ তাঁর (সা.) চেহারা চিনত না। কুবার বাইরে যখন তিনি (সা.) একটি বৃক্ষের নীচে বসেছিলেন এবং মানুষ দৌঁড়ে মদীনা থেকে তাঁর কাছে ছুটে আসছিল, তখন যেহেতু মহানবী (সা.) খুব সাধারণভাবে বসেছিলেন, তাই তাদের মধ্যে যারা তাঁকে চিনত না তারা হযরত আবু বকর (রা.)-কে দেখে, যিনি বয়সে ছোট হলেও তাঁর দাড়িতে কিছুটা পাক ধরেছিল, অনুরূপভাবে তার পোশাকও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেয়ে কিছুটা ভালো ছিল, এটিই মনে করছিল যে, আবু বকরই হলেন রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং পরম শ্রদ্ধার সাথে তাঁর দিকে মুখ করে বসছিল। হযরত আবু বকর (রা.) এটি দেখে বুঝতে পারেন যে, মানুষ ভুল ভাবছে। তিনি দ্রুত সূর্যের সামনে চাদর মেলে ধরে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার ওপর রোদ পড়ছে, আমি আপনার ওপর ছায়া দিচ্ছি। এই সূক্ষ্ম উপায়ে তিনি মানুষকে তাদের ভুল ধরিয়ে দেন।" **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২২৬-২২৭)**

এ ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বুখারীর একটি উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করে বলেন। বুখারীতে বারা বিন আযেব (রা.)'র একটি রেওয়ায়েত রয়েছে

যে, মহানবী (সা.)-এর মদীনা আগমনে আনসারগণ যেরূপ আনন্দিত হয়েছিলেন অন্য কোন উপলক্ষ্যে আমি তাদেরকে সেরূপ আনন্দিত হতে দেখি নি।

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ আনাস বিন মালেক এর বরাতে বর্ণনা করেছে যে, মহানবী (সা.)-এর আগমনে আমরা এরূপ অনুভব করি যে, আমাদের জন্য মদীনা আলোকোজ্জ্বল হয়ে গেছে। আর যেদিন তিনি (সা.) মৃত্যু বরণ করেন, মদীনা শহরকে ঐদিনের চাইতে অধিক অন্ধকার আমরা আর কখনো দেখি নি।

যারা স্বাগত জানাতে এসেছিল, তাদের সাথে সাক্ষাতের পর মহানবী (সা.) কোন ধারণার ভিত্তিতে, যার উল্লেখ ইতিহাসে নেই, সরাসরি শহরের ভেতরে প্রবেশ করেন নি বরং ডান দিকে সরে গিয়ে মদীনার উঁচু অংশের জনবসতি যা মূল শহর হতে প্রায় দুই বা আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, যার নাম ছিল কুবা– সেখানে গমন করেন। সেখানে আনসারদের কয়েকটি পরিবার বাস করতো, যাদের মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আমর বিন অওফ (রা.)'র পরিবার ছিল। আর সেই যুগে এই বংশের নেতা ছিলেন কুলসূম বিন আল্ হিদম। কুবার আনসাররা মহানবী (সা.)-কে খুবই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় আর তিনি (সা.) কুলসূম বিন আল্ হিদমের বাড়িতে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.)-এর পূর্বে যেসব মুহাজির মদীনায় পৌঁছে গিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশও তখন কুবায় কুলসূম বিন আল্ হিদম এবং অন্যান্য সম্মানিত আনসারের নিকট অবস্থান করছিলেন। একারণেই হয়তো মহানবী (সা.) প্রথমে কুবা'য় অবস্থান করা পছন্দ করেছেন। মুহূর্তের মধ্যেই গোটা মদীনায় মহানবী (সা.)-এর আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সমস্ত মুসলমান আনন্দের আতিশয্যে উদ্বেলিত হয়ে দলে দলে গিয়ে তাঁর অবস্থান স্থলে সমবেত হতে আরম্ভ করে। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ২৬৪-২৬৫}**

'মসজিদে কুবা' নির্মাণ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, কুবায় অবস্থানকালে মহানবী (সা.) একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন যাকে **মসজিদে কুবা** বলা হয়। সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে, মহানবী (সা.) বনু আমার বিন অওফের মহল্লায় দশ রাতের অধিক অবস্থান করেন এবং সেই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন যার ভিত্তি তাক্ওয়ার ওপর রাখা হয়েছে আর তাতে মহানবী (সা.) নামায পড়েন। **(বুখারী, কিতাব মানাকেবিল আনসারি, বাবু হিজরাতিন্ নবীয়্যে (সা.) ওয়া আসহাবিহি ইলাল মদীনাতি, হাদীস নংঃ ৩৯০৬)**

রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বনু আমর বিন অওফের জন্য মসজিদের ভিত্তি রাখেন। এর ভিত্তি স্থাপনের সময় মহানবী (সা.) প্রথমে কিবলার দিকে একটি পাথর রাখেন, এরপর হযরত আবু বকর (রা.) একটি পাথর এনে রাখেন, এরপর হযরত উমর (রা.) একটি পাথর নিয়ে এসে হযরত আবু বকর (রা.)'র পাথরের পাশে রেখে দেন আর এরপর সবাই এর নির্মাণ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মসজিদে কুবার নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময় মহানবী (সা.) পাথর আনতেন আর সেটিকে তিনি তাঁর পেটের সাথে লাগিয়ে রাখতেন অর্থাৎ, পাথর খুবই ভারি ছিল। এরপর তিনি (সা.) সেটিকে (এনে) নিচে নামিয়ে রাখতেন। এক ব্যক্তি এসে সেই পাথরটি উঠাতে

চায় কিন্তু সে উঠাতে পারে নি। তখন তিনি (সা.) তাকে নির্দেশ দেন এটি ছাড় এবং অন্য কোন পাথর নিয়ে আসো। **(আর্ রওযুল উন্‌ফ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩২, তাসীস মসজিদে কুবা, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

মসজিদে কুবা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এটিই সেই মসজিদ যার ভিত্তি তাক্ওয়ার ওপর রাখা হয়েছিল। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েতে মসজিদে নববীকে সেই মসজিদ আখ্যা দেয়া হয়েছে যার ভিত্তি তাক্ওয়ার ওপর রাখা হয়েছিল। সীরাতে হালবিয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ দু'টি বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কেননা এ দু'টি মসজিদের প্রত্যেকটির ভিত্তি তাক্ওয়ার ওপর রাখা হয়েছে। এ বক্তব্যের সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)'র রেওয়ায়েত রয়েছে। এই রেওয়ায়েত অনুসারে তাঁর মতামত ছিল, মদীনার সকল মসজিদ যেগুলোর মধ্যে কুবার মসজিদও অন্তর্ভুক্ত সেগুলোর ভিত্তি তাক্ওয়ার ওপর রাখা হয়েছিল। কিন্তু যে (মসজিদ) সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল সেটি আসলে মসজিদে কুবা-ই। **(আস্ সীরাতুল্ হালবিয়্যাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

১০ দিন অথবা ১৪ দিন অবস্থানের পর শুক্রবার মহানবী (সা.) কুবা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে বনু সালেম বিন অওফের জনবসতিতে পৌঁছলে জুমুআর (নামাযের) সময় হয়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদের সাথে **রানূনা উপত্যকার মসজিদে** জুমুআর নামায পড়েন আর তাদের সংখ্যা ছিল ১০০ জন। রানূনা উপত্যকাটি মদীনার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। মহানবী (সা.)-এর এখানে জুমুআর নামায পড়ার পর থেকে এই মসজিদকে মসজিদুল জুমুআ বলা শুরু হয়। এটি ছিল মদীনাতে মহানবী (সা.)-এর প্রথম জুমুআর নামায। **(আস্ সীরাতুল্ হালবিয়্যাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮১, বাবুল হিজরাতি ইলাল মদীনাতি, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত), {সীরাতুন্ নবূবিয়্যাহ্ লি-ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩৪, বাবু হিজরাতির্ রসূল (সা.), দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত}, {এটলাস সীরাতুন্ নব্‌ভী (সা.), পৃঃ ১৬৮}**

সম্ভবত এখানে জুমুআর নামায পড়ার কারণেই পরে সেখানে এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে আর এজন্যই এই নাম রাখা হয়েছে। এছাড়া উল্লেখ পাওয়া যায় যে, জুমুআর নামায পড়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর উটনীতে আরোহণ করে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন আর তখন তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে (নিজের বাহনের) পিছনে বসিয়ে নিয়েছিলেন। **(শরাহ্ আয্ যুরকানী আলাল্ মওয়াহিবিল্ লাদনিয়্যাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৭, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)**

পুরস্কারের লোভে অনেক লোকই মহানবী (সা.)-এর পশ্চাদ্ধাবনের চেষ্টা করে। ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে একটি ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা হল, বুরায়দাহ্ বিন হুসায়েব বর্ণনা করেন, কুরাইশরা যখন তার জন্য একশ' উট পুরস্কার ঘোষণা করে– যে মহানবী (সা.)-কে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে, তখন আমাকেও লোভ পেয়ে বসে। তাই আমি বনু সাহম গোত্রের সত্তরজন লোক সাথে নিয়ে বের হই এবং তাঁর (সা.) কাছে পৌঁছে যাই। তিনি (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? আমি বললাম, বুরায়দাহ্। তখন তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র দিকে

তাকিয়ে বলেন, হে আবু বকর! আমাদের জন্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও শান্ত হয়ে গিয়েছে। এরপর তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন গোত্রের মানুষ? আমি বললাম, আসলাম গোত্রের। তিনি (সা.) বলেন, নিরাপদ থাকো। এরপর জিজ্ঞেস করেন, কার সন্তান? আমি বললাম, বনু সাহমের সন্তান। তিনি (সা.) বলেন, হে আবু বকর! তোমার **সাহম,** অর্থাৎ, তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হল। এরপর বুরায়দাহ্ মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কে? তিনি (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্। তখন বুরায়দাহ্ বলেন, **আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।** এরপর বুরায়দাহ্ এবং তার সঙ্গে যারা ছিল তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। বুরায়দাহ্ বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার জন্য, বনু সাহম স্বেচ্ছায় ও সানন্দে এবং কোন প্রকার বলপ্রয়োগ ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করে। সকাল হলে বুরায়দাহ্ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মদীনায় প্রবেশের সময় আপনার সাথে একটি পতাকা থাকা উচিত। এরপর তিনি তাঁর মাথা থেকে পাগড়ি খুলে সেটিকে নিজের বর্শায় বেঁধে দেন এবং মুসলমানদের মদীনায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর সামনে সামনে হাঁটতে থাকেন। **(শরাহ্ আয্ যুরকানী আলাল্ মওয়াহিবিল্ লাদনিয়্যাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত), (আস্ সীরাতুল্ হালবিয়্যাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭১, বাবুল হিজরাতি ইলাল মদীনাতি, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

সহীহ্ বুখারীতে মহানবী (সা.)-এর মদীনায় আগমন সম্পর্কে হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)'র এরূপ একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) মদীনায় আসেন এবং মদীনার উঁচু এলাকায় বনু আমর বিন অওফ নামে খ্যাত একটি গোত্রের জনবসতিতে অবতরণ করেন। মহানবী (সা.) তাদের মাঝে চৌদ্দ রাত অবস্থান করেন। এরপর বনু নাজ্জার গোত্রকে ডেকে পাঠান। তারা তরবারিতে সজ্জিত হয়ে আসেন। এই ঘটনা আমার এত ভালোভাবে স্মরণ আছে যে, এখনও যেন আমি মহানবী (সা.)-কে তাঁর বাহনে আরোহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) পেছনে বসা ছিলেন এবং তাঁর (সা.) চারপাশে বনু নাজ্জারের লোকেরা ছিল। অবশেষে তিনি (সা.) হযরত আবু আইয়ূব (রা.)'র প্রাঙ্গণে শিবির স্থাপন করেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস্ সালাত, বাব হাল তুমবুশু কুবুরুল্ মুশরিকিল্ জাহিলিয়্যাহ্, হাদীস নংঃ ৪২৮)**

এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, "কুবায় দশ দিনের বেশি অবস্থানের পর জুমুআর দিন মহানবী (সা.) মদীনার কেন্দ্র-অভিমুখে যাত্রা করেন। আনসার ও মুহাজিরদের একটি বড় দল তাঁর (সা.) সাথে ছিল। তিনি (সা.) একটি উটনীতে আরোহিত ছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর পেছনে বসেছিলেন। এই কাফেলা ধীরে ধীরে শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পথিমধ্যে জুমুআর নামাযের সময় হলে মহানবী (সা.) বনু সালেম বিন অওফের পাড়ায় যাত্রা বিরতি দেন আর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে জুমুআর নামায পড়েন। ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন, যদিও এর পূর্বেই জুমুআর

প্রচলন হয়ে গিয়েছিল তবুও এটিই প্রথম জুমুআ ছিল যা তিনি (সা.) স্বয়ং পড়েন আর এরপর থেকে নিয়মিতভাবে জুমুআর নামাযের প্রচলন হয়ে যায়।" (একথা থেকেও বুঝা যায় সেই মসজিদটি পরে বানানো হয়েছিল।)

"জুমুআ'র নামায শেষে মহানবী (সা.)-এর কাফেলা পুনরায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে তিনি (সা.) যখন মুসলমানদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা ভালোবাসার আতিশয্যে এগিয়ে এসে নিবেদন করছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এ হল আমাদের বাড়িঘর। আমাদের সম্পদ ও প্রাণ আপনার সেবায় নিবেদিত, আর আমাদের কাছে সুরক্ষা বিধানের ব্যবস্থাও রয়েছে; আপনি আমাদের কাছে অবস্থান করুন! তিনি (সা.) তাদের মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন এবং ধীরে ধীরে শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মুসলমান নারী ও মেয়েরা আনন্দের আতিশয্যে বাড়ির ছাদে উঠে গাইতে থাকে–

طَلَعَ الْبَدْر عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاع

وَجَبَ الشّكْر عَلَيْنَا مَا دَعَى لِلّٰهِ دَاع

অর্থাৎ, **'আমাদের ওপর আজ ওয়াদা'আ পাহাড় থেকে চতুর্দশী চাঁদ উদিত হয়েছে। তাই আমাদের জন্য খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চিরদিনের জন্য আবশ্যক হয়ে গিয়েছে'**। মুসলমান শিশুরা মদীনার অলিতে গলিতে গাইতে থাকে **"মুহাম্মদ (সা.) এসে গেছেন, খোদার রসূল এসে গেছেন"**। আর মদীনার হাবশি দাসরা মহানবী (সা.)-এর আগমনের আনন্দে তরবারির বিভিন্ন কসরত দেখাচ্ছিল। মহানবী (সা.) যখন শহরে প্রবেশ করেন তখন প্রত্যেকের মনোবাসনা এটিই ছিল যে, তিনি (সা.) যেন তার বাড়িতেই অবস্থান করেন আর সবাই প্রতিযোগিতামূলকভাবে নিজেদের সেবা উপস্থাপন করছিল। সবার সাথেই তিনি (সা.) হৃদ্যতাপূর্ণ কথা বলতে বলতে সামনে অগ্রসর হন। এভাবে তাঁর (সা.)-এর উষ্ট্রী বনু নাজ্জারের পাড়ায় গিয়ে পৌঁছে। সেখানে বনু নাজ্জারের লোকেরা মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানানোর জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সাঁড়িবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল আর গোত্রের মেয়েরা ঢোল-বাদ্য বাজিয়ে এই পংক্তি গাইছিল যে,

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ

অর্থাৎ, আমরা বনু নাজ্জারের মেয়েরা কতইনা সৌভাগ্যবতী যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের পাড়ায় অবস্থানের জন্য এসেছেন।" **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃ: ২৬৬-২৬৭}**

মহানবী (সা.)-এর নিজের এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র পরিবার-পরিজনকে মদীনায় ডেকে পাঠানোর ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কিছুদিন পর, অর্থাৎ, মদীনায় আগমনের কিছুদিন পর তিনি (সা.) তাঁর মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ (রা.)-কে মক্কায়

প্রেরণ করেন যাতে তিনি তাঁর (সা.)-এর পরিবার-পরিজনকে নিয়ে আসেন। যেহেতু মক্কাবাসীরা এই আকস্মিক হিজরতের কারণে কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল তাই কিছুদিনের জন্য অত্যাচার নির্যাতন বন্ধ ছিল আর এই আতঙ্কের কারণেই তারা মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র পরিবারের মক্কা ত্যাগের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয় নি, ফলে তারা নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে যান। এরই মধ্যে মহানবী (সা.) যে জমি ক্রয় করেছিলেন সেখানে সর্বপ্রথম তিনি (সা.) মসজিদের ভিত্তি রাখেন আর এরপর নিজের এবং নিজ সঙ্গীসাথীদের জন্য বাড়ি নির্মাণ করেন।" **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২৩০)**

মদীনায় হিজরতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) **সুনহ্**'য় হযরত খুবায়েব বিন এসাফ (রা.)-এর বাড়িতে উঠেন। সুনহ্ মদীনার শহরতলির একটি জায়গা যা মসজিদে নববী (সা.) থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত খুবায়েব (রা.) বনু হারেস বিন খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। এক বর্ণনা অনুসারে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.)'র গৃহে অবস্থান নিয়েছিলেন। **{আস্ সীরাতুন্ নবূবিয়্যাহ্ লি-ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩৪৮, বাবু হিজরাতির্ রসূল (সা.), দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত}**

কতক রেওয়াযেত অনুসারে হযরত আবু বকর (রা.) সুনহ্'তেই নিজের বাড়ি এবং কাপড় বানানোর কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। **(মুকালাত সীরাত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১, লাহোরের ইসলামীয়া ছাপাখানা থেকে ২০১৬ সালে প্রকাশিত)** আর এখান থেকেই ব্যবসাবাণিজ্য করেছেন। ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে।

এ পর্যায়ে আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। তাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন, মরহুম চৌধুরী আসগর আলী কালার সাহেব, যিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কারাবরণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি বাহাওয়ালপুরের মুহাম্মদ শরীফ কালার সাহেবের পুত্র ছিলেন। ১০ জানুয়ারি বন্দি অবস্থায় তিনি অসুস্থ হন এবং সে অবস্থায়ই তিনি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি শহীদদের মাঝেই গণ্য হবেন। ঘটনার বিবরণ অনুসারে মরহুমের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরে বাহাওয়ালপুরের বাগদাদ আলজাদীদ পুলিশ স্টেশনে ২৯৫ সি ধারায় (নাউযুবিল্লাহ্) রসূল অবমাননার (তথাকথিত) অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয় এবং ২৬ সেপ্টেম্বর তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরা আহমদীদের বিরুদ্ধে রসূল অবমাননার অভিযোগ উত্থাপন করতে আর বিলম্ব করে না। গ্রেফতার হওয়ার পর মরহুম বাহাওয়ালপুর জেলে ছিলেন। জেলখানায় রক্তবমি এবং স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় মরহুমকে ৪ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে বাহাওয়ালপুর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়, সেখানে চিকিৎসা চলতে থাকে। অবশেষে ১০ জানুয়ারি সকালে ফজরের পূর্বে সেখানে তিনি বন্দি অবস্থায়ই ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স ছিল ৭০ বছর।

মরহুমের জামিনের আবেদন আদালতে শুনানির অপেক্ষায় ছিল আর ৮ জানুয়ারি তার জামিনের তারিখ ছিল কিন্তু পুলিশ নথিপত্র নিয়ে আসে নি বিধায় বিচারক ১১ জানুয়ারি জামিনের তারিখ প্রদান করে কিন্তু সিদ্ধান্তের পূর্বেই মরহুম চিরসত্য মনিব (আল্লাহ তা'লার) সকাশে উপস্থিত হয়ে যান। মরহুম আল্লাহ্‌র রাস্তায় তিন মাস পনেরো দিন বন্দি ছিলেন।

মরহুম তার জীবনের শুরুর দিকেই তথা মাধ্যমিকের পর ১৯৭১ সালে নিজেই বয়আ'ত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়েছিলেন। তিনি (তার) পরিবারে একা আহমদী ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর বিরোধিতা পূর্ণ পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও (তিনি) অবিচল ছিলেন। লাহোরের এফসি কলেজ থেকে তিনি গণিতে এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। ছাত্রাবস্থায় আহমদীয়াতগ্রহণের কারণে পিতামাতা তার আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেয় এবং শর্ত আরোপ করে যে, আহমদীয়াত পরিত্যাগ করলে পরেই ভবিষ্যতে পড়ালেখার খরচাদি প্রদান করা হবে। এতদসত্ত্বেও মরহুম (সত্যের ওপর) অবিচল থাকেন এবং বাচ্চাদের প্রাইভেট পড়িয়ে নিজের পড়াশোনার ব্যয়ভার নির্বাহ করেন। মরহুমের পিতা তার তাক্‌ওয়া ও অবিচলতায় প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীতে তার বিরোধিতা পরিত্যাগ করেন। আর এই আশঙ্কাকে দৃষ্টিপটে রেখে যে, পাছে আহমদী ছেলেকে অ-আহমদী পিতার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা না হয়, তাই নিজের জীবদ্দশায়ই তার প্রাপ্য অংশ তাকে লিখে দেন। তার প্রতি এই পুণ্যটি তার পিতা করেছেন। মরহুম আল্লাহ্‌র কৃপায় এক অষ্টমাংশ ওসীয়্যত করেছিলেন। বিভিন্ন আর্থিক তাহরীকে তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। নববর্ষের ঘোষণা হতেই তিনি সম্পূর্ণ চাঁদা দিয়ে দিতেন। খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে ঐকান্তিক ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তার মাঝে ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী এবং কেন্দ্রীয় অতিথিদের সম্মান ও আতিথেয়তার গুণটি ছিল উল্লেখযোগ্য। জামাতের সফরের জন্য তিনি সর্বদা নিজের গাড়ী ব্যবহার করতে দিতেন। তবলীগের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। নির্ভীক ও সাহসী দাঈ ইলাল্লাহ্‌ ছিলেন। মরহুমের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা অনেক পুণ্যাত্মাকে বয়আ'ত করে আহমদীয়াতভুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। নিয়মিত নামায, রোযা ছাড়াও যথারীতি তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। দরিদ্রদের সাহায্যকারী এবং সৃষ্টির সেবক, হিতৈষী মানুষ ছিলেন। বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি পরিবারের সবার আর্থিক ও মানবিক সেবার তৌফিক পেয়েছেন। মরহুমের শাহাদতবরণের গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল যা আল্লাহ তা'লা এভাবে পূর্ণ করেছেন।

মরহুমের স্ত্রী বর্ণনা করেন যে, জেলখানায় সাক্ষাতকালে মরহুম বলেছেন, **আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে তিনি তিনবার সালাম-এর বার্তা পেয়েছেন**। আর তিনি বলেছেন, **দ্বিতীয় স্বপ্নে আমি জেলখানা থেকে আমার লাশ বের হতে দেখেছি**। মরহুম নাযেম আনসারুল্লাহ্‌, যয়ীমে আলা বাহাওয়ালপুর শহর, সেক্রেটারী দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌, সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ, জেলা সেক্রেটারী ইসলাহ্‌ ও ইরশাদ হিসেবে জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি জেলার কাযীও ছিলেন। (শোকসন্তপ্ত) পরিবারে মরহুম স্ত্রী ছাড়াও দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তান

রেখে গেছেন। তার এক ছেলে দেশের বাইরে আছে আর মেয়েও কানাডায় থাকে। আল্লাহ তা'লা আসগর আলী কালার সাহেবের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং (তার) মর্যাদা উন্নীত করুন। তার (শোকসন্তপ্ত) পরিবারকে ধৈর্য দিন এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন অন্যান্য বন্দিদেরও মুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ মির্যা মুমতাজ আহমদ সাহেবের যিনি ওকালতে উলীয়া, রাবওয়ার একজন কর্মী ছিলেন। ৮৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াত তাঁর পিতা ক্যাপ্টেন ডাক্তার শের মুহাম্মদ আলী সাহেবের মাধ্যমে আসে যিনি ১৯২৩ সনে বয়আ'ত করেছিলেন। মির্যা মুমতাজ সাহেব ১৯৬৪ সালে তাহরীকে জাদীদের আমানত দপ্তরে লিপিকার হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন এবং আমৃত্যু তথা ৫৮ বছর সেবা প্রদানের সৌভাগ্য পেয়েছেন। মুকাররম চৌধুরী মুজাফফর উদ্দিন বাঙ্গালী সাহেবের কন্যা মাজেদা বেগমের সাথে তার বিয়ে হয়েছে। তার গর্ভে আল্লাহ্ তা'লা তাকে দুই পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান দান করেছেন।

তার দৌহিত্র খালেদ মনসুর লিখছেন, নানা আমাদেরকে সর্বদা জামাতের সেবায় রত থাকার উপদেশ দিতেন। সর্বদা বাজামাত নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করতেন এবং (আমাদেরকে) উপদেশ দিতেন। তিনি বলেন, আমার পিতার মৃত্যুর পর নানাজান আমাকে তার অভাব অনুভব করতে দেননি। সর্বদা তাকে বন্ধুরূপে পেয়েছি। সর্বদা জামাতের কাজে ব্যস্ত দেখেছি। একজন আদর্শ বন্ধু ও পিতা এবং জামাতের একজন আদর্শ কর্মী ছিলেন। প্রত্যেকের সাথে ভালোবাসা, প্রীতিময় ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন। খুবই সময়ানুবর্তী ছিলেন এবং এর গুরুত্ব বুঝাতেন।

তার একজন সহকর্মী সাঈদ নাসের সাহেব বলেন, দীর্ঘকাল তার সাথে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। পরম নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার সাথে কাজ করতেন এবং নিজের কাজ সম্পন্ন করার পর সহকর্মীদের কাজেও সাহায্য করতেন।

এরপর লোকমান সাকেব নামের একজন মুরুব্বী সাহেব বলেন, আমি দেখেছি, ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ সচেতনতার সাথে, সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন। শেষ সময় পর্যন্ত স্মরণশক্তি খুবই প্রখর ছিল। অনেক বছর পূর্বের কোন বিষয়ও তৎক্ষণাৎ বলে দিতেন যে, এই বিষয়টি অমুক স্থানে অমুক ফাইলে আছে। পরিচ্ছন্ন রসিকতা পছন্দ করতেন এবং উপভোগ করতেন। কিন্তু অকারণে অনর্থক কথা বলা বা গল্পগুজব করা তার স্বভাবে ছিল না। নিজের কাজ সম্পন্ন করার পর সময় পেলে অফিসের চেয়ারে বসেই পুরোনো কোন ফাইল পড়তে আরম্ভ করতেন।

ডাঃ সুলতান মুবাশ্বেরও তার সম্পর্কে লিখেন, (তিনি) অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। একজন জ্যেষ্ঠ কর্মী হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতালে আসলে নিজের সিরিয়ালের অপেক্ষা করতেন আর কখনো তাড়াহুড়া করতেন না। তার মাঝে কৃতজ্ঞতাবোধ ও গুণগ্রাহীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি পরম ধৈর্যশীল

ছিলেন। দীর্ঘ অসুস্থতার অতিশয় কষ্ট সত্ত্বেও তিনি অধৈর্য হন নি এবং কয়েকজন সহকর্মী বন্ধু ছাড়া তাঁর খুব বেশি বন্ধুবান্ধব ছিল না।

আমিও সর্বদা তাকে খুবই নীরব প্রকৃতির মানুষ হিসেবে দেখেছি এবং নিজের কতিপয় বন্ধুর সাথেই ওঠাবসা করতেন। বাসা থেকে অফিস, অফিস থেকে বাসায় আসা যাওয়াই তার নিত্যদিনের রীতি ছিল। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের সাথে কাজ করতেন। অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সাথে তিনি জীবনযাপন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা এবং দয়াসুলভ আচরণ করুন। তার সন্তান-সন্ততিকেও তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ডাঃ আব্দুল খালেক সাহেবের। তিনি ফযলে উমর হাসপাতালে সাবেক প্রশাসক ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৯৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তার বংশে তার পিতা মিয়াঁ মুহাম্মদ আলম সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত এসেছে, যিনি ১৯১৯ সালে বয়আ'ত করেছিলেন আর ডাক্তার আব্দুল খালেক সাহেব ১৯৩৮ সালে বয়আ'ত করেছিলেন। নিজের বয়আ'তের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় আব্বাজান আল্ ফযল পত্রিকা আনাতেন। এটি অধ্যয়নের ফলে আহমদীয়াতের প্রতি (আমার) মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এবং ১৯৩৮ সালে আমরা তিন ভাইবোন বয়আ'ত করি। (আমাদের) শ্রদ্ধেয়া মা নিয়মিত নামায ও রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন। আমাদের বয়আ'তের কিছুদিন পর তিনিও বয়আ'ত করেন। ১৯৩৯ সালের জুবিলীর জলসায় আমি প্রথমবার কাদিয়ানে যাই আর এরপর থেকে অধিকাংশ জলসায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। ১৯৮৭ সালে তার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। তার দুই ছেলে এবং দু'জন মেয়ে রয়েছে।

তার এক ছেলে ডাক্তার আব্দুল বারী জামাতে আহমদীয়া ইসলামাদের আমীর। ১৯৭৪ সালে ভুট্টো সরকার আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা করার অন্যায় আইন পাশ করলে ডাক্তার সাহেব সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে দেন এবং নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে (জামাতের) সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৭৭ সালে তাকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সিয়েরা লিওনে প্রেরণ করা হয় যেখানে তিনি তিন বছর মানবসেবার তৌফিক লাভ করেন। এরপর ১৯৯২ সালে তাশকন্দে পিআইএ বিমান পরিসেবা চালু হলে ডাক্তার সাহেব এই সুযোগকে যথোপযুক্ত মনে করে তাশকন্দ ও উজবেকিস্তানে ওয়াক্‌ফে আরযী করার আবেদন করেন। কেন্দ্র তার আবেদন মঞ্জুর করলে, ছোট বোনকে সাথে নিয়ে তিনি সমরকন্দ ও বুখারায় ওয়াক্‌ফে আরযী করেন আর এ সময় (তিনি) নিঃস্বার্থভাবে মানবসেবাও করেন। আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোর সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে রাবওয়ার ফযলে উমর হাসপাতালের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। যেখানে তিনি ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রায় দশ বছরের অধিক সময় সেবাপ্রদানের তৌফিক লাভ করেন। তার যুগে ফযলে উমর হাসপালের সম্প্রসারণ ও নির্মাণের অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এরপর তার সম্পর্কে সম্ভবত (তার) কোন সন্তান লিখেছে যে, আশি, একাশি বছর বয়সে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও তার সেবার প্রেরণা যুবকের (মতো) ছিল। কিন্তু এই

উপলব্ধিও হচ্ছিল যে, আমি বৃদ্ধ হচ্ছি। তাই তিনি ২০০৫ সালে অবসরের আবেদন করে আমাকে জানালে তাকে অবসর প্রদান করা হয়। দায়িত্বমুক্ত হওয়ার পর তিনি স্থায়ীভাবে ইসলামাবাদে বসবাস আরম্ভ করেন। ইসলামাবাদে তিনি স্থানীয় কাযী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার বড় ছেলে ডাক্তার আব্দুল বারী সাহেব বলেন, সন্তানদের ধর্মীয় ও নৈতিক তরবীয়তের বিষয়ে তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। সকাল-সন্ধ্যা বরং সবসময় তিনি কুরআন পাঠে মগ্ন থাকতেন এবং (এর প্রতি) তার গভীর অনুরাগ ছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ক্ষেত্রে তিনি সকল সিদ্ধান্ত পবিত্র কুরআনের (শিক্ষার) আলোকেই গ্রহণ করতেন।

তার জামাতা ওয়াহ্‌কেন্ট জেলার নায়েব আমীর ডাক্তার মুজাফ্‌ফার আলী নাসের সাহেব বলেন, আজ অবধি কাউকে দিনভর এতো বেশি কুরআন পাঠ করতে দেখিনি। কুরআনের প্রতি তার (গভীর) ভালোবাসা ছিল। একবার হাসপাতাল থেকে (তিনি) ছাড়া পেলে স্টাফরা উদাস হয়ে যায় যে, (এখন) আমাদেরকে কুরআন শোনাবে কে? শীত-গ্রীস্মে তার নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া আমাদের জন্য একটি আদর্শ ছিল। খিলাফত ও জামাতের প্রতি (তার) গভীর ভালোবাসা ছিল। অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করতেন এবং কখনো কোন অভিযোগ করেন নি।

তার ভাইয়ের দৌহিত্র আব্দুস সামাদ রিযভী লিখেন, তিনি মহান আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করেছেন। নিজের সুখ ও আনন্দকে বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি বলেন, রাবওয়ায় তার বাসায় আমার কয়েকবার থাকার সুযোগ হয়েছে, তার সত্তা আমার জন্য জীবন্ত খোদাকে চেনার কারণ হয়েছিল। তার তাহাজ্জুদের নামায ছিল অতুলনীয়। খিলাফতের প্রতি তার ছিল গভীর সম্মান ও ভালোবাসা, যা আমাদের সর্বোত্তম তরবীয়তের কারণ হয়েছে।

ফযলে উমর হাসপাতালের ডাক্তার অব্দুল খালেক বলেন, (মরহুম) ডাক্তার সাহেব নবীন ডাক্তারদের সাথে ভালোবাসা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন আর নবীন ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য প্রবীণ ডাক্তারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। হাসপাতালের সম্পদ সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে তত্ত্বাবধান ও সুরক্ষা করতেন। নিজের পকেট থেকে দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করতেন।

ডাক্তার মুহাম্মদ আহমদ আশরাফ বলেন, (মরহুম) অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। কোমল হৃদয়ের অধিকারী, সহিষ্ণু এবং পরম স্নেহশীল মানুষ ছিলেন। (তিনি) বেশি কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলেন না কিন্তু ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও গভীর দৃষ্টি রাখতেন এবং নিয়মনীতি পালন করাতেন। অন্য ডাক্তারদের এবং নিজের জামাতা ও ছেলেদেরকেও ফযলে উমর হাসপাতালে ওয়াক্‌ফে আরযী করার জন্য আহ্বান জানাতেন।

মহান আল্লাহ্ মরহুমের প্রতি ক্ষমা এবং দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার পুণ্যসমূহ তার সন্তানদের মাঝেও অব্যাহত রাখুন। নামাযের পর তাদের (গায়েবানা) জানাযার নামায পড়বো, ইনশাআল্লাহ্।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, পৃঃ ৫-১০)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)